Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

‘অশনি-সংকেত’: ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংস্কার ও মানবিকতার মূল্যবোধ

সুচিত্রা কড়ার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/10_Suchitra-Karar.pdf

সারসংক্ষেপ: বাংলায় আকাশে পঞ্চাশের মন্বন্তর মানুষের জীবনে আতঙ্ক বয়ে এনেছিল। মানুষ দু’মুঠো খাবারের অভাবে পথে পথে ঘুরে বেরিয়েছে, শহর ছেড়ে কলকাতার মতো অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছে। আবার বাংলার গ্রামীণ মানুষ বনের শাক পাতা থেকে শুরু করে পুকুরের গুগলি, শামুক তুলে খেয়েছে। খেতে না পেয়ে পথের দুধারে মরে পরে থেকেছে। পঞ্চাশের এই ভয়াবহ দৃশ্য বিভূতিভূষণ নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর এই বাস্তব অভিজ্ঞতায় কীভাবে একটি ব্রাহ্মণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সংস্কারের মূল্যবোধের চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিয়েই এই প্রবন্ধ। এই সময় একদিকে মজুতদার, মহাজনরা চাল অন্যত্র সরিয়ে ছয় টাকা মন চালের দাম একলাফে বাড়িয়ে দেয় প্রথমে দশ-বারো টাকায় তারপর পরর্বতী সময়ে চালের দাম ওঠে ত্রিশ-চল্লিশ টাকায়। এতে দরিদ্র তো বটেই, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের পক্ষেও চাল কিনে ভাত খাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের জীবন, সময়, সমাজে জড়িয়ে যায়, যেহেতু জীবন, সময় ও সমাজের মূল্যবান দলিল সাহিত্য, তাই ‘অশনি সংকেত’এ এর ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: বাংলাদেশ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ব্রাহ্মণ, সংস্কার, দুর্ভিক্ষ, মধ্যবিত্ত পরিবার, মহামারী, জীবিকা

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক) আবির্ভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনাকে নিজের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করলেও তার পটভূমি, সামাজিক পরিবেশ, প্রকৃতি চেতনা, ব্যক্তি-মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। বিভূতিভূষণ কাজের সূত্রে বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে যেমন বাঙলার পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি ভাগলপুর, ঘাটশিলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থানকালে পাহাড় ও অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবারও সুযোগ হয়েছিল। এ সমস্তই তাঁর মনস্তত্ত্ব গঠন এবং সাহিত্য রচনায় বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতিচেতনা, অধ্যাত্মচেতনা এবং বর্তমান বিশ্বচেতনার স্বরূপ-উপলব্ধি ও অতীতের ঘটনার স্মৃতিচারণ — তিনটি প্রধান উপাদানকে অবলম্বন করে বিভূতিভূষণের সাহিত্যজগৎ গড়ে উঠেছিল। এই জীবন-দর্শনকেই তিনি তাঁর রচনায় রূপায়িত করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। তাঁর কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’ চিরায়ত বাঙালি জীবনে উপন্যাস রূপে মহাকাব্য। তিনি যখন ‘অশনি সংকেত’ রচনা শুরু করেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ এর গোরায়। রেডিওতে বক্তৃতা উপলক্ষে বিভূতিভূষণ এসেছিলেন কলকাতায়, ঘাটশিলায় থাকার কারণে ৪৩এর মন্বন্তরের মর্মান্তিক রূপ তিনি দেখেননি, তাই কলকাতার রূপ দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। এই মর্ম বেদনারই ফল ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসটি। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ‘মাতৃভূমি’ পত্রিকায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস থেকে। ১৩৫৪তে পত্রিকাটি প্রকাশ বন্ধ হলে উপন্যাসটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসটি তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। এরপর ১৯৫৯ সালে লেখকের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ‘অশনি সংকেত’। উপন্যাসটিকে একই নামে সত্যজিৎ রায় ১৯৭৩ খ্রি. চলচ্চিত্রে নির্মাণ করেন। আন্তর্জাতিক বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছাড়াও এই চলচ্চিত্রটি বেশ কয়েকটি জাতীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে।

বাংলা ১৩৫০ (১৯৪৩), বাংলার ইতিহাসে কুখ্যাত মন্বন্তরের বছর হিসেবে পরিচিত। আমাদের দেশে প্রতিবছরই চালের ঘাটতি হয় কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয় না। এই সময় কেবল খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতাই দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল না; বরং বাজারে খাদ্যশস্যের ওপর আধিপত্য এবং ব্যাপক দুর্নীতি এজন্য দায়ী ছিল। আবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের বাহ্যিক কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর ও বার্মা (মায়ানমার) দখল করে নেয়, ফলে যুদ্ধ ভারতে প্রবেশ করে। কলকাতাতেও বোমাবাজি শুরু হয়। তখনকার সময়ে দুই বাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য চালের অধিকাংশই বার্মা থেকে সরবরাহ করা হতো। মায়ানমারের হয়ে সেনারা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তাই প্রধানমন্ত্রী ডব্লুউ চার্চিল ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধারণা শত্রুকে ঘায়েল করতে এমন সব প্রয়োজনীয় বস্তুকে ধ্বংস করতে হবে যা তাঁদের জন্য অপরিহার্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয়। ফলস্বরূপ তাঁরা নৌব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়, ভেঙে পড়ে কৃষিব্যবস্থা। সেনাদের জন্য সকল জায়গা থেকে মজুদ করা হলো খাদ্যশস্য। এমনকি জাপানি সেনাদের নাগাল থেকে দূরে রাখতে চালের গুদামগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হলে, বাজারে চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে ফলে গ্রামাঞ্চলে দেখা দেয় খাদ্য সংকট। সর্বোপরি বাংলার ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে আসে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা। খাবারের অভাবে প্রাণ যায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের। পথের উপর পড়ে থাকতে দেখা যায় মানবদেহ। দুর্ভিক্ষের এই ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে গ্রাম জীবনের করুণ আখ্যান বিভূতিভূষণের ‘অশনি সংকেত’ উপন্যাসটি। এই সময় মজুতদার মহাজনরা চাল অন্যত্র সরিয়ে ছয় টাকা মন চালের দাম একলাফে বাড়িয়ে দেয় প্রথমে দশ-বারো টাকা এবং তারপর ত্রিশ-চল্লিশ টাকায়। এতে দরিদ্রতো বটেই, নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের পক্ষেও চাল কিনে ভাত খাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘চল্লিশের দিনগুলি’ কবিতায় তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ভয়াবহতা তুলে বলেছিলেন,

“মানুষগুলি তখন পোকামাকড়ের মতো মরে যাচ্ছিল’... ‘সে বড় অদ্ভুত এক সময় / পলকা ঠুনকো কাচের বাসনের মতোই তখন ভেঙে যাচ্ছিল সব মুল্যবোধ।”[১]

‘অশনি সংকেত’ একটু আলাদা। দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তার বর্ণনা তিনি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণ দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য রেখে আক্ষেপ করে বলেছেন, “এত বড়ো মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশ, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কী ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যান-প্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথা নায়কের প্রেমনিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্র্যাডিশনে কতকগুলি পৌরাণিক নাটক।”[২]

যুদ্ধ কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক শক্তি ও চালিত অস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন, সময়, সমাজ জড়িয়ে যায় যেহেতু জীবন, সময় ও সমাজের মূল্যবান দলিল সাহিত্য, তাই বাংলা সাহিত্যে এর ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের শুরুতে একটি প্রতীকের মাধ্যমে লেখক ঘটনার মূল সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। নদীতে দুটি স্ত্রীলোক স্নানরতা। একজন প্রৌঢ়া একজন তরুণী —

“প্রৌঢ়া বললে — ও বামুন-দিদি, ওঠো — কুমীর এয়েচে নদীতে —”[৩]

সচ্ছন্দ গতিতে জীবন প্রবাহ বয়ে চলা এক শান্ত, সবুজ, ক্ষুদ্র, নিস্তরঙ্গ গ্রামে হঠাৎ প্রাণঘাতী ‘কুমীরে’র আবির্ভাব যেন প্রাণঘাতী বিপদের সংকেত বহন করে নিয়ে এসেছে। উপন্যাসে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কাহিনিতে লেখক দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন। লেখক তাঁদের সচ্ছল সংসারের পরিচয় দিয়েছেন। পরিবারের কর্তা গঙ্গাচরণ পাড়াগাঁয়ের একমাত্র উচ্চবর্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর দুই সন্তান ও স্ত্রী অনঙ্গাকে নিয়ে সংসার। গঙ্গাচরণ শিক্ষিত এবং চতুর। ব্রাহ্মণ বিহীন এক নতুন গ্রামে তাঁরা আসে, গ্রামে কাপালী ও গোয়ালার বসবাসের সুযোগ বুঝে ব্রাহ্মণ হিসাবে সকলের প্রতি নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এই গ্রামেই বসবাস শুরু করে। সরল গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পেয়ে খুশি হয়। গ্রামের লোক তাঁকে মাথায় করে রাখে। গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ হিসাবে সকলের প্রিয় হওয়াতে অনেকেই তাঁদের ভালোবেসে জিনিসপত্র দেয়। এই সুযোগে গঙ্গাচরণ এই গ্রামেই প্রধান পুরোহিত হয়ে টোল খোলার পরিকল্পনা করে। তাঁর স্ত্রী অনঙ্গা নিজের মধুর ও স্নেহশীল স্বভাবের জন্য অচিরেই

গ্রাম্য বধুদের ভালোবাসা অর্জন করে। সব মিলিয়ে সুখেই দিন কাট ছিল তাঁদের, কিন্তু এই সুখ তাঁদের কপালে বেশি দিন সইলো না। হঠাৎ নেমে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া যার ফলে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাপন বদলে যায়। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই অজপাড়া গাঁইয়ে দেখা দেয় দুর্যোগ। গোলাভরা ধান, নদীভরা মাছ, ক্ষেতভরা সবজি গ্রামের ভেতর বেড়ে ওঠা মানুষগুলো দু'মুঠো ভাতের জন্য অনাহারে মারা যেতে পারে একথা তাঁদের কল্পনাতেও কখনো আসেনি। তাই গ্রামের মোড়ল বিশ্বাস মশাই যখন বলেন —

"— এবার যে রকমডা দেখছি, না খেয়ে লোক মরবে।

কথাটা গঙ্গাচরণের বিশ্বাস হোল না। না খেয়ে আবার লোক মরে? কখনো দেখা যায় নি কেউ না খেয়ে মরেচে। জুটে যায়ই কোনো-না-কোনো উপায়ে। যে দেশে এত খাবার জিনিস, সে দেশে লোকে না খেয়ে মরবে?"[৪] কিন্তু তারাই দেখল হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে বাজারে চালের দাম। গ্রামে খাদ্যের আকাল দেখা দিলে, একদিন যারা মাছ-সবজি ব্রাহ্মণকে সেবা দিতো তারাই দু-মুঠো চালের জন্য গ্রামের পর গ্রাম ঘুরতে লাগল। গঙ্গাচরণের হাঁড়িতেও টান পড়ল। এক বেলা যদি খাবার জোটে তবে উনুন জ্বলে। গ্রামের পর গ্রাম উজার হতে লাগল, আহারের তাড়নায় অভাবী গঙ্গাচরণের বাড়িতেই আশ্রয় নেয় ক্ষুধায় আক্রান্ত পরিচিতরা। পিতা-মাতার দুঃখ-দীর্ঘশ্বাস বাড়িয়ে অনঙ্গোর কোলে আসে তৃতীয় সন্তান। ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষ চালের অভাবে ভাতের আশা ছেড়ে দেয়। এই অবস্থায় তাঁরা কচুর ডগার শাক, মেটে আলু খাওয়া শুরু করে। কিন্তু একটা পর্যায় তাও শেষ হয়ে যায়। তখন তাঁরা পুকুর, নদী থেকে শামুক-গুগলি তুলে খাওয়া শুরু করে। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ বিশ্বাসমশাইয়ের উপর আক্রমণ হওয়াতে তিনি গ্রাম ছাড়েন। গঙ্গাচরণ হারিয়ে ফেলেন তাঁর শেষ আশ্রয়স্থলটুকু। পরবর্তী সময়ে গ্রামের মানুষ অনাহারে থাকতে থাকতে মারা যেতে শুরু করে। এই দুর্ভিক্ষে মানুষ তার নিজের গোঁড়ামী, আত্মদম্ভ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার সবকিছু ভুলে গিয়ে মানুষ হিসেবে বাঁচতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষ যে কতটা শক্তিশালী, কতটা অনভিপ্রেত এবং ক্ষুধার তাড়না জীবনের রাস্তায় কত বড়ো পট পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে — এই উপন্যাসে লেখক মায়ামাখানো গ্রাম বাংলার মানুষের রূপের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন।

সময়টা ছিল অখণ্ড বাংলার। এই সময় মানুষের স্বপ্ন অর্থ অট্টালিকা বা প্রতিষ্ঠান নয়, শুধু দু'মুঠো ভাত আর একটু ফ্যানের। এই উপন্যাস পড়ার পর বোধ করি মুখের খাবার নষ্ট করা কঠিনই হয়ে পড়বে। এই উপন্যাসটিতে পাঠক দুর্ভিক্ষের জীবন্ত এবং সর্বগ্রাসী রাক্ষস রূপ দেখতে পায়, মনুষ্যত্বের অন্তস্থল থেকে — যা সংবেদনশীল মানুষের হৃদয়ে হাহাকার জাগায়। আবার এখানেই দেখি স্বাধীনতার পূর্বে বাঙলার ধনী দরিদ্র সব মানুষের ভিতরের এক অদ্ভুত অহংকারকে। বিভিন্ন জাতের মানুষের সংমিশ্রণে যে ছবি বিভূতিভূষণ এঁকেছেন তা মনোগ্রাহী। গঙ্গাচরণের ছবিতে দেখি, গঙ্গাচরণ মনে করেন নিছক জন্মানোর জোরেই তাঁর অনেক কিছুর অধিকার প্রাপ্য, "... ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে থাকে না রাতদিন!... উঠে আয় ওখান থেকে। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কী কাপালীর ছেলের মত দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত?... ওসব শিক্ষে ভালো না। ব্রাহ্মণের ছেলে, ওরকম কি ভালো?"[৫] তবে সবচেয়ে স্পষ্ট যে বিষয়টি নজরে পরে তা হলো তাঁর জাতিভেদ। 'ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কী কাপালীর ছেলের মত দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত?' কিংবা 'তোমাদের উচ্ছিষ্ট কলকেতে আমি তামাক খাব?' — এখানে জাত সম্পর্কে আমরা তাঁর অহংকার দেখতে পাই। গঙ্গাচরণ সেই প্রকৃতির মানুষ যারা নিজের উঁচু জাতে জন্মানোর সুযোগ নিয়ে অন্যদের শোষণ করতে দ্বিধা করে না। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'পরজীবী ব্রাহ্মণ'। জীবিকার সন্ধানে বৌ-সন্তান নিয়ে নিজ গ্রাম ছাড়েন গঙ্গাচরণ। সে এমন সব গ্রামে অবস্থান করেছে যেখানে ব্রাহ্মণের বাস নেই; এতে ওই গ্রামে তাঁর পসার থাকবে। গঙ্গাচরণ চরিত্রের আর একটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করবার দাবী রাখে। যেমন, গঙ্গাচরণ পাঠশালার পাশাপাশি পুরোহিত এবং বদ্দির কাজও করেন। শিক্ষা, ধর্ম বিশ্বাস এবং চিকিৎসাকে পুঁজি করে যে-কোনো জায়গা দখলে রাখা যে সম্ভব, তা বেশ সুক্ষ্মভাবে নিয়ে এসেছেন বিভূতিভূষণ এখানে। গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গাকে বলতে শুনি,

"... উড়ে উড়ে বেড়িয়ে কি করবে — এখানেই থাকা যাক। আমার বড্ড পছন্দ হয়েচে। কোন জিনিসের অভাব নেই। মুখের কথা খসতে যা দেরি —

— রও, সবদিক থেকে বেঁ’ধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের। চাষা গাঁ, জিনিস বলো, পত্তর বলো, ডাল বলো, মুলো বেগুন বলো — কোনো জিনিসের অভাব হবে না। এ গাঁয়ে পুরুত নেই ওরা বলচে, চক্কত্তি মশাই, আমাদের লক্ষ্মীপূজো, মনসা পূজোটাও কেন আপনি করুন না?

— সে বাপু আমার মত নেই।... শুদ্দুর-যাজক বামুন হোলে লোকে বলবে কি?”[৬]

‘সবদিক থেকে বেঁ’ধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের।’ — এই উক্তিটি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে কাউকে অধিকারে রাখার। এছাড়া উপমহাদেশে স্যার ডাকার বিষয়টির পাওয়া যায়। ‘গুরুমশায় কী রে? সার্ বলবি। শিখিয়ে দিইচি না?।’ তবে উপন্যাসের শুরুতে তাঁর ব্রাহ্মণ্য অহংকার ও অধিকারবোধ আরো প্রবল ছিল। “... ওহে রামলাল, ভালো কথা, এবার নতুন সর্ষে হয়েছে ক্ষেতে? দুকাঠা পাঠিয়ে দিও তো। আমি বাজারের তেল খাইনে... সর্ষে দিয়ে কলুবাড়ী থেকে ভাঙিয়ে নিই।

— যে আজ্ঞে। আমার ছেলে ওবেলা দিয়ে যাবে’খন।”[৭]

গঙ্গাচরণ ভাববাদী নয় বাস্তববাদী। তবে তাঁর চাহিদা খুব বেশি ছিল না। তিনি বৈষয়িক এবং সংসার নির্বাহের জন্য অধীত বিদ্যার দ্বারা চাতুরির মাধ্যমে মহামারী দূরীকরণের উপায় বলে দেন গ্রামবাসীদের,

“... সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ হবে — ফর্দ করে দিচ্চি নিয়ে যাও।

লোকটা যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এত গম্ভীর ভূমিকার পর মাত্র ত্রিশটি টাকা খরচের প্রস্তাব সে আশা করে নি। কিন্তু গঙ্গাচরণের উচ্চাশা সীমা পৌঁছে গিয়েচে, ভাতছালাতেও যাকে স্ত্রীপুত্রসহ অনেক সময় দিনে রাতে একবার মাত্র অন্নাহার করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েচে, সে এর বেশী চাইতে পারে কি করে?”[৮]

এখানে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিফলন দেখি অন্যদিকে মানবিকতারও ছবি দেখি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাল শুরু হওয়ার তাঁদের দ্রুত চরিত্র বদলে যেতে থাকে। মানুষের খাদ্য-অভাবের দিনে ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখানোর কোনো অবকাশই আর রইল না, জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেঁচে থাকাটাই বড়ো হয়ে উঠল, অন্য সব ভাবনা-নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ্য অহংকারের পরিবর্তে চরম বিপর্যয়ের সময় গঙ্গাচরণ ও দিনু ভট্টাচার্যের মধ্যে জেগে ওঠে মানব ধর্ম। মতি-মুচিনী মৃতদেহ সৎকার, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, আসলে যে-কোনো বড়ো বিপর্যয় মানুষের জীবনেও পরিবর্তন বয়ে আনে। তুলনাতে স্ত্রী অনঙ্গা একেবারেই অন্য ধাঁচের মানুষ। সে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে, ব্রাহ্মণের অহংকার তাঁর নেই। তাই কায়িক পরিশ্রম করে উপার্জন করতে তাঁর দ্বিধাবোধ হয় না। “... লোকে আমায় বলে বলবে, আমার ছেলেপুলে তো দু’মুঠো পেট ভরে খেতে পাবে।”[৯] সমগ্র উপন্যাসে ওই সময়কার প্রচলিত ব্রাহ্মণ চরিত্র হিসাবে গঙ্গাচরণকে তুলে ধরা হয়েছে এবং অনঙ্গাকে মানবিকতার প্রতীক হিসাবে চিরায়িত বাঙালি রমণীর প্রতিমূর্তি করা হয়েছে, যে কিনা অতিথি পরায়ণ। গঙ্গাচরণকে বলতে শুনি, “তোমার যে পাগলামি। বলে, নিজে খেতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।”[১০] নিজে না খেয়ে হলেও অতিথিকে সেবা করার অনঙ্গা। কিছুটা সুখ এবং আক্ষেপের সুরে তাই গঙ্গাচরণ বলেন,

“ওর সঙ্গে মিছে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতে ও চিরকাল অভ্যস্ত। অথচ মুখ ফুটে বলবে না কখনো — কি খেয়েচে না খেয়েচে। এমন স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বড় মুশকিলের কাণ্ড!”[১১]

একদিন এই বামুনদির কথাতেই সংসার ছেড়ে যাওয়া কাপালী বউ বাড়ি ফিরে আসে। অনঙ্গা স্বামীকে লুকিয়ে অন্যের বাড়িতে ধান ভাঙার কাজ করে, শাক, লতা, মেটে আলু কুড়িয়ে স্বামী ছেলের মুখে খাবার তুলে দেয়। চতুর গঙ্গাচরণ নিজের জন্য কিছু চাল সংগ্রহ করে রাখলেও শেষ রক্ষা হয় না। স্ত্রী অনঙ্গাকে পরিশ্রম করে উপার্জন করাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গঙ্গাচরণ সম্মতি দেয়। আবার ক্ষান্তমনি নামের আর একটি চরিত্র লুকিয়ে গঙ্গাচরণের হাতে চাল তুলে দেয় এই দুর্ভিক্ষেও।

ব্রাহ্মণ পরিবারের লড়াই উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ দুর্ভিক্ষ নিয়ে এই উপন্যাসটি কাল্পনিক গল্প

নয় বরং তিনি এখানে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসিক পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই দুর্ভিক্ষের কথা পৌঁছে দিতেই উপন্যাসটি নির্মাণ করেন।

তিনি দেখাতে চেয়েছেন খাদ্যের অভাব কীভাবে একটা এলাকাকে কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হতে পারে, তারই যন্ত্রণায় ছবি। মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মানুষের কান্না ও অধঃপতন, মানবতার, লাঞ্ছনা ও বেদনা লেখককে এতটাই বিচলিত করেছিল যে তিনি তাঁর পূর্বের মানসিকতা থেকে সরে এসে এ ধরনের ভিন্ন স্বাদের রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। উপন্যাসিক কাহিনির মধ্যে একটা পর্যায়ে মানুষ মরা শুরু হলে সকল মানুষের মধ্যে মানবিকতার আর্দশ জাগ্রত করেন। মুচিদের মেয়ে মতি অনাহারে মরে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ত্যাগ করে গঙ্গাচরণ মতির সৎকার করেন। গঙ্গাচরণ বলেন, “ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েচে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত।”[১২] অনাহারের আগুনে ছাই হয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের বিনাশের আশনি সংকেত। নিস্তেজ নিস্তরঙ্গা ব্রাহ্মণ পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে, ছটো একটা গ্রামকে নির্ভর করে গড়ে ওঠা উপন্যাসে লেখক দেখান, দুর্ভিক্ষ কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করেছিল।

বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস একেবারে অন্য ধারার সৃষ্টি। উপন্যাসটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে যখন আমরা দেখি ভাতের জন্য কাপালীদের ছোটোবৌ নিজের শরীর বিকিয়ে দেয় পরপুরুষের কাছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গঙ্গাচরণের ঘরে আশ্রিত দুর্গা ভট্টাচার্য মন্বন্তরের অনাহার ও অন্নাভাবের কারণে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সে বলে, “ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হোল, ভিক্ষা।”[১৩] কিন্তু মন্বন্তরে যে ভিক্ষা মেলে না তা তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় ছিল না। উপন্যাসে গঙ্গাচরণ ব্রাহ্মণদের পরান্নজীবী মানসিকতার মূলে আঘাত করেছেন, “যার জমি নেই এ বাজারে, তাকে উপোস করতেই হবে। জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গাল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা”[১৪] কর্তা হিসেবে পারিবারিক স্বার্থের কথা ভাবতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন দিয়ে হলেও পৈতের প্রভাব খাটিয়েছেন গঙ্গাচরণ। অনঙ্গা বউ শুধু বাঁচার নয় বাঁচানোর চেষ্টাও করেছে। এখানে ক্ষুধা দরিদ্র ও মৃত্যুর উপর জয়ী হয়েছে মনুষ্যত্ব যা আত্মরক্ষার স্বরূপ। মতি চলে গেলেও যদু পোড়ার হাতছানি থেকে ফিরে এসেছে কাপালী বউ, খুদা হেরে গেল মনুষ্যত্বের কাছে। আবার অশ্রু জলের মধ্যেও বেজে ওঠে আনন্দের মঙ্গাল শঙ্খ, নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। আসলে লেখক বলতে চেয়েছেন প্রবল ধ্বংসের মধ্যেও সৃষ্টিরা থেমে থাকে না। বিভূতিভূষণ তাঁর অঙ্গীকার মতো সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকেই রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। জীবনে দুঃখই শুধু সত্য নয়, জীবনের আনন্দঘন দিকটিকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। সুখী হওয়ার জন্য রোজ আমরা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছি কিন্তু বিশ্বাস আর ভালোবাসা থাকলে একমুঠো ভাত দুজনে ভাগ করে খাওয়ার মাঝেও সুখ আছে, তৃপ্তি আছে। যা অনঙ্গা মাধ্যমে লেখক দেখান। কারণ কোনো অশনি সংকেত, কোনো দুর্ভিক্ষ মানবিকতার সেই সুখ কেড়ে নিতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

১. ‘বাংলা কথাসাহিত্য চল্লিশের সময় ও সমাজ’, আসরফী খাতুন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯

২. ‘বিভূতি বীথিকা’, শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যম, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ১২, পৃ. ২৮৬

৩. ‘অশনি সংকেত’, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, প্রথম ‘অমর’ সংস্করণ, পৌষ ১৩৭১, পৃ. ১

৪. ওই, পৃ. ৪৪
৫. ওই, পৃ. ২
৬. ওই, পৃ. ২-৩
৭. ওই, পৃ. ৬
৮. ওই, পৃ. ২৩
৯. ওই, পৃ. ৪৫
১০. ওই, পৃ. ৫৩
১১. ওই, পৃ. ৪০
১২. ওই, পৃ. ৯৪
১৩. ওই, পৃ. ৮৮
১৪. ওই, পৃ. ৯০

লেখক পরিচিতি: সুচিত্রা কড়ার, বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সরকারের অনুদান প্রাপ্ত পিএইচ.ডি গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।